Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 25-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারত ছাড়ো আন্দোলন : ফিরে দেখা বাংলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভূমিকা

পরিতোষ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গালসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা

Abstract

One of the neglected issues in India's history is the history of indigenous people in the national movement. It can be said that the Adivasis had protested against the British rule in their own way. Besides, they did not keep themselves far from the national movement. From all the scattered researches that have been done so far, it has been exposed that the indigenous people played equally important as well as significant role in the national movement. Whether or not the general public participated in their protest, they took an important role in the national movement. It is generally assumed that the marginalized indigenous people did not play a significant role in national movement. Even there are some researchers who tended to claim that the leaders of upper stratum often try to suppress the significant role of the indigenous people, especially the Santhali to the freedom struggle to a great extant.

In this research paper, I will try to show the role of indigenous Santhals of Bengal in the Quit India Movement. Santhals have been the third largest community of indigenous people who use to reside mainly in the Eastern part of India in Bihar, Orissa, Jharkhand, Assam and Bengal. Among the indigenous people, Santhals are the highest in West Bengal. We all know that 'Hool' or 'Santhal Rebellion' of 1855 had given special identity to them. It is said that Hool was the first remarkable agitation against the British colonial rule. Since then, the British government compelled to pay special attention to their demands. Nowadays many scholars are ascribing importance to these indigenous communities. The purpose of this research paper is to focus and explore the contribution of the Santhals to the Quit India movement of 1942 through the lens of their active participation, their activities, their relations with the national leaders, their regional activities etc.

Keywords: Denial Policy, Poramatir Neeti, Jatiy Sarkar, Santhals, Christian College, Adivasi Mahasabha, Quit India Movement, National liberation movement.

সূচনা: 'Do or Die' গান্ধীজীর বলা এই শব্দদ্বয় সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিস্থিতি বর্ণনার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই সময় গান্ধীজীকে পাওয়া গিয়েছিলো নতুন ভাবে। ১৯৪২- এর গ্রীষ্মে গান্ধীকে দেখা গেল এক বিচিত্র তথা অন্যন্য জঙ্গি মেজাজে। ভারতকে সঁপে দাও ভগবানের, অথবা অরাজকতার হাতে—তিনি বারবার ব্রিটিশদের

জানান—'এই সুশৃঙ্খল নিয়মানুগ অরাজকতার বিদায় নেওয়াই উচিত, আর তার ফলে যদি চূড়ান্ত বেকানুনি আসে তো আমি সে ঝুঁকি নেব'[1] । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে গান্ধীজীর মতো নেতাও 'Do or Die' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ৮ই অগাস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনর এর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরের দিনই, প্রায় সকল জাতীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। ফলে আন্দোলন একরকম নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিলো। দেশবাসী নিজেদের মতো করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো। ফলে আন্দোলনের চরিত্র স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে পড়েছিলো। আন্দোলন প্রাথমিক পর্বে শহরের মধ্যে বিস্তার ঘটেছিলো। পরবর্তীতে সময়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলো। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা মুলত পূর্ব ভারতে আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সর্বাধিক। শহরে আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যুবক, ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বেশি। এছাড়া নারীদেরও ভূমিকাও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ একটা চরম অস্থির অবস্থায় পৌছেছিল। একদিকে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা, অপর দিকে জাপানের বার্মা ও মালয় জয়লাভ ভারতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। ইংরেজদের কাছ থেকে জাপানের বার্মা ও মালয় দখলের ফলে, সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের চরম দূর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এদের ভয়ঙ্কর দুর্দশার কথা শুনে, ভারতবাসী আশু জাপানী আক্রমনের ভয়ে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতক্ষ সংগ্রামের কথা ভাবতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার উপকূলবর্তী এলাকায় বিশেষ নীতি গ্রহন করছিল, যেমন 'ডিনায়াল পলিসি'[2] । এই ডিনিয়াল পলিসি হলো, ব্রিটিশ সরকার জোর করে জনসাধারনের কাছ থেকে মোটর, লরি, বাইসাইকেল, নৌকা প্রভৃতি কিছু বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কারণ জাপান ভারতবর্ষ দখল করলেও, যাতে কোন ভাবেই ভারতীয় সম্পত্তি ব্যবহার করতে না পারে, তাই আগে থেকেই ব্রিটিশ সরকার উপকূলবর্তী ভারতীয়দের এই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ছিলো। বিভিন্ন জলযান যেমন নৌকা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, অনেক কিছু পুড়িয়ে দেওয়ায় হয়েছিল। মোদ্দাকথা জাপানি আক্রমণের আগাম ভয়ে এই ডিনিয়াল পলিসি নেওয়া হয়েছিলো। এই নীতিকে রাশিয়ার 'পোড়ামাটি' নীতির সাথে তুলনা করা যায়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির আক্রমণের প্রতিরোধে রাশিয়া গ্রহণ করেছিলো। ডিনিয়াল পলিসির ফলে জনসাধারনের রুজিরোজগারে টান পড়েছিল। জাতীয় জীবনের এরকম পরিস্থিতিতে, ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'Quit India' প্রস্তাব গ্রহন করেছিল। সেদিন গান্ধীজী জাতির উদ্দেশ্য দীর্ঘ, ১৪০ মিনিটের বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'I want freedom immediately, this very night before dawn if it can be had.....The must win freedom or be wiped out in the effort....'[3]. দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর মতো নেতাও 'Do or Die' মন্ত্রে শপথ নিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উপনিবেশে কোন বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে চাইছিলেন না। সেইজন্য তাঁরা ক্রিপস মিশন ভারতে পাঠিয়েছিলেন ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন কারনে যখন ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়েছিলো। তবুও ভারতীয়রা যখন আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়েছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, তা বোঝা যায় ৮ই আগষ্ট বড়লাটের গভর্নরদের উদ্দশ্যে লিখিত বয়ান থেকে যথা- 'I feel very strongly that the only possible answer too 'declaration of war' by any section of Congress in the present circumstances, must be a declared determination to crush the organization as a whole'[4]. ৯ই আগষ্ট গান্ধী সহ প্রথম সারির নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে আন্দোলন কে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, সেটাই বোধ হয় ভারতীয়দেরকে আরও বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ভারতবাসী তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য।

প্রথম দিকে আন্দোলন শুরু হয়েছিল শহরে যথা বম্বে, দিল্লী, আমেদাবাদ, পুণে। তারপর সমগ্র উত্তর বিহার, যুক্ত প্রদেশের পূর্বাংশ, মাদ্রাজ, বাংলা, উড়িষ্যা, সাঁতারা, খান্দেশ, ব্রোচ প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন শহরকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। তারপর বিপ্লবীরা শহর থেকে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে আন্দোলন গ্রামে ছড়িয়ে

দিয়েছিল। প্রথমে বোম্বাই প্রদেশ বিস্তৃত অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন উচ্চবর্ণের পাশাপাশি নিম্নবর্ণের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো। হেনিংহাম তার গবেষনায় বিহারে আন্দোলনের দুটি ধারার উল্লেখ করেছেন, যথা একটি মধ্যবিত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অপরটি নিম্নবর্ণের দ্বারা পরিচালিত গুজরাটি। পটিডার ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি আদিবাসীরাও সমান ভাবে অংশগ্রহন করেছিল। ১১ই আগষ্ট মুঙ্গের, ভাগলপুর, মুজঃফরপুর, পুর্নিয়া অঞ্চলে জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল। রাঁচিতে তানা ভগৎরা খুবই সক্রিয় ছিল[5]। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গান্ধীজির 'Do or Die' বাণী প্রচার করেছিল। উড়িষ্যায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। সরকারী রিপোর্টে এই অঞ্চলের আন্দোলনকে 'পুরোপুরি ছাত্র বিদ্রোহ' বলেই উল্লেখ করা হয়েছিল[6]।

আদিবাসী অধ্যুষিত কোরাপুরে লক্ষন নায়ক নামে একজন নিরক্ষর গ্রামবাসী নেতৃত্ব দিয়েছিল। এখানে কর বয়কট, অরণ্য সত্যাগ্রহ, থানা আক্রমণ প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। মধ্য প্রদেশে কোষাগার লুণ্ঠন, ডাকঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের লাট সাহেব স্বীকার করেছিল যে - 'For 72 hours the Nagpurians ruled Nagpur'. আসামের তেরো বছরের নাবালিকা কনকলতা বুড়ুয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। আসামের তেজপুর, গোয়ালপাড়া, বরপেতা, শিবসাগর, লখিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সরকারি ভবন আক্রান্ত হয়েছিল এবং পুলিশের সাথেও সংঘর্ষ ঘটেছিল। নঁওগা জেলাকে তো বাংলার মেদিনীপুরের সাথে তুলনা করা হয়েছিল[8]। দক্ষিন ভারতের পশ্চিম গোদাবরী ও গুন্টর জেলা বর্তমান কেরলের কালিকট কোট্টায়ম, মাদ্রাজের ত্রিচিনাপল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি এলাকায় বিমা শ্রমিকদের ধর্মঘট, কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটেছিল। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। করাচি ও পেশোয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটেছিল। সুতরাং বলা যায় ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিন পূর্ব ও পশ্চম প্রায় প্রতিটি প্রান্তে কমবেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। এদের মধ্যে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের পূর্বাংশেই আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সর্বাধিক। জ্যোতিরাও ফুলের সত্যশোধক সমাজের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিম্নবর্ণের মানুষজন সাঁতারা অঞ্চলে প্রতি সরকার গঠন করেছিল[9]। যুক্ত প্রদেশের হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ মনোভাব ছিল আন্দোলনের অন্যতম সম্প্রীতির উদাহরণ[10]।

এবার আলোচনা করব বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন এর বিস্তার ও সাঁওতালদের অংশগ্রহন। ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার আদিবাসীদের মতো বাংলার আদিবাসীরাও পিছিয়ে ছিল না। আদিবাসীদের ভূমিকা গান্ধী আন্দোলনে অসাধারণ ছিল বলা চলে। দেশের অন্যান্য প্রান্তের থেকে পূর্ব ভারতের আদিবাসী সাঁওতালরাই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসঙ্গত পূর্ব ভারতেই সাঁওতালরা সবচেয়ে বেশি বসবাস করে। আরও বলা যায় প্রথম বড় গান্ধী আন্দোলন যথা অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনেও সাঁওতালদের অবদান উল্লেখ করার মতো ছিল। বাংলায় এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর জেলা। মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি অঞ্চলে আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সর্বাধিক[11]। মেদিনীপুরের তুমলুকের থানা ঘেরাও ও মাতঙ্গী হাজরার শহীদ হওয়া এক অতি পরিচিত ঘটনা। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ বাহিনী নামক স্বেচ্ছাসেবক দলের কার্যাবলী খুবই উল্লেখযোগ্য। নভেম্বর মাসে কাঁথিতে স্বরাজ পঞ্চায়েত ও ১৭ই ডিসেম্বের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার উদ্বোধন হয়েছিল। এই জাতীয় সরকারের কাজ চলেছিল ১৯৪৪ সালের অগাস্ট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর আহ্বানে তাঁরা আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন। কাঁথির স্বরাজ পঞ্চায়েতও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল১১১[12]। এগরাতেও আন্দোলন যথেষ্ট উত্তেজক ছিল। সরকারকে অচল করার জন্য বিভিন্ন ধ্বংসাত্বক কার্যাবলী পরিচালনা করা হয়েছিল। রাস্তা কেটে, কাঁচের টুকরো ফেলে সেনা বাহিনী ও পুলিশের যাতায়াত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মেদিনীপুরে আদিবাসীদের 'আদিবাসী মহাসভা' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল[13]। মহাসভার কয়েকজন নেতার নাম পারগানা মনসারাম মান্ডি, পারগানা কালিচরণ সরেন, পারগানা সুরেন্দ্রনাথ সরেন প্রমুখরা। এই মহাসভা ১৯৪১ সালে সাহাড়ীর মাঠে মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরকে বিভিন্ন দাবি পেশ করে ছিল[14]। সরকার তাদের দাবির প্রতি

কোন দৃষ্টিপাত করেনি। Quit India আন্দোলনের সময় সাঁওতালরা তাদের শোষন বঞ্চনার প্রতিশোধ নিয়েছিল। তারা সরকারী আয়ের অন্যতম উৎসগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ফাগু মুর্মুর নেতৃত্বে শিলদা, বিনপুর, পরিহাটি, জামবনী, দাহিজুড়ীর আবগারী দোকান গুলি ভাঙ্গচুর করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের খবর শুনে উৎসাহিত হয়ে আদিবাসীরা গড়বেতা, শালবনী, গোয়ালতোড়, রামগড় প্রভৃতি এলাকার মদের দোকান গুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বাবুলাল সরেন গড়বেতার একজন নেতা। যিনি গ্রামে, হাটে, বাজারে, উৎসবে, মেলায় স্বদেশী ভাবধারা প্রচার করতেন। জনগণকে জমিদার ও ইংরেজদের কোন প্রকার খাজনা দিতে বারণ করেছিলেন। রামগড়ের নিকট লাল গড়িয়ায় লক্ষীরাম হেমব্রম ছিলেন অপর একজন নেতা[15]। যিনি আবগারী বন্ধ ও সরকারকে নানা প্রশাসনিক অসুবিধায় ফেলেছিলেন। বিপ্লবীদের আত্মগোপন করার ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করতেন। মেদিনীপুরের আন্দোলনের সার্বিক বর্ননা করতে গিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন- 'There was a deliberate challenge throughout to the Government'[16.]

বাঁকুড়া জেলায় সাঁওতালদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল[17]। তাঁরা ট্যাক্স বন্ধ, পোস্ট অফিস দখল কর নিয়েছিলো। ৭ই অক্টোবর বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত ৩টি মদের দোকানে বিপ্লবীরা অগ্নিসংযোগ করেছিলো। এই থানার মনোহরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ডাকঘরে ও খাতরা চৌকির ডাকঘরে বিপ্লবীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো[18]। ৮ই অক্টোবর বড়জোড়া থানার বেলিয়াতোর ডাকবাংলো ও ছান্দায় এর মদের দোকানে উত্তেজিত জনতা ধ্বংস করেছিলো। খাতরা থানার মদের দোকান ধ্বংসের ক্ষেত্রেও সাঁওতালরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁরা বুজতে পেরেছিলো যে তাঁদের মদের নেশায় বুঁদ করে দিকুরা সমস্ত সম্পত্তি লুট করছে। এই আবগারি দপ্তরই তাঁদের দুর্দশার মূল কারণ। ৮ই অক্টোবর বাঁকুড়া থানার কাঞ্চানপুর, কদমঘাট, বেলবনির আবগারি দপ্তরগুলিও আক্রমণ করেছিলো।

বাঁকুড়ার পদ্মলোচন মান্ডি হাইস্কুল শিক্ষক, যিনি বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন দেশ সেবার জন্য। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাঁকুড়ায় ফিরে এসেছিলেন ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারেঙ্গার অর্নেষ্ট সরেন যার সেবামুলক কাজ ও লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য সুনাম ছিল। পদ্মলোচন মান্ডি, জিতেন্দ্রমোহন সরেন, কমলাকান্ত হেমব্রম, রাজীবলোচন কিস্কু এরা সাঁওতালী সংস্কৃতি বাঁচানোর জন্য নিজেদের মধ্যে সভা করতেন। আন্দোলন চলাকালীন বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস এই সভাকে আহ্বান করলে, তাঁরা আন্দোলনে যোগদান করেছিলো[19]। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্ররা, মেদিনীপুর কলেজের ছাত্রদের আহ্বানে এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। সেই সময় খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র অমিয় কিস্কু আন্দোলনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তার কাছ থেকে জানা যায় যে ছাত্রদের ক্লাস বয়কট, অধ্যক্ষকে ঘেরাও, থানা আক্রমণ, টেলিগ্রাফ ও রেললাইন ধ্বংস প্রভৃতি ছিল তাঁদের কর্মসূচী[20]।

বীরভুম জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সাঁওতাল ও নিম্নবর্ণের মানুষজনের কার্যকলাপ ছিল তাৎপর্য পূর্ণ। এখানে তারা অহিংস, সহিংস দুই পথেই আন্দোলন করেছিল। যুদ্ধকালীন বিমানঘাটি নির্মানের কাজে সাঁওতালরা কর্ম বিরতি করেছিল। রামপুরহাট, মল্লারপুর, দুবরাজপুর, বোলপুর, কোপাইয়ে সাঁওতালরা আন্দোলনে অতিসক্রিয় ছিল। টেলিগ্রাফ ও রেললাইন ধ্বংস প্রভৃতি করেছিল। কিছুদিন ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই জেলায় আন্দোলনের অন্যতম ঘটনা হল বোলপুর স্টেশনের সেনা ও পুলিশের সাথে সাঁওতালদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। ২৩শে আগষ্ট ধনীচরণ রায়, চন্ডী সরকার ও মনোরঞ্জন দত্তের নেতৃত্বে কয়েক হাজার সাঁওতাল ও নিম্নবর্ণের মানুষ বোলপুর স্টেশনে জমায়েত হয়েছিল। যে চাল সামরিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার অন্যত্র মজুত করতে চেয়েছিল তাতে জনতা বাধা দিয়েছিল, ফলে সেনা ও পুলিশের সাথে সাঁওতালদের গোলাগুলি তীর ধনুকের লড়াই হয়েছিল। বেশ কিছুজন আহত এবং একজন আন্দোলনকারী মারা গিয়েছিল[21]।

পুরুলিয়া জেলার বড়বাজার, বান্দোয়ান, পটন্দা ও পুরুলিয়া শহরে আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। মাহাতো, ভূমি, খেরিয়া, শবররা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আক্রমণকারীদের লক্ষ বস্তু ছিল মদভাঁটি, থানা, রাস্তা, রেলপথ ও সরকারি অফিস। নদীয়া জেলায় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে গোপন সংগ্রামী বাহিনীর আবদান ছিল

উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এর বিশেষ অবদান ছিল নদীয়া জেলায়[22]। হুগলি, বর্ধমান জেলাতে আন্দোলনে আদিবাসীদের প্রভাব ছিল খুব কম। দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য জেলাতে ভারত ছাড় আন্দোলনে সাঁওতালদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল তার তথ্য আমি পাইনি, তাই এই গবেষণা পত্রে বাকি জেলা গুলির চিত্র আলোচনা করা সম্ভব হল না। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে সমস্ত জেলার আন্দোলনের চিত্র আরও সুস্পষ্ট হবে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি কীরূপ ছিল এবার সেদিকে নজর দেবো। প্রথমেই বলি উত্তরবঙ্গের মধ্যে মালদা ও দিনাজপুর অগ্রগণ্য ছিল। মালদায় চারুচন্দ্র সিদুপ সরেন ছিলেন আন্দোলনের নেতা। যিনি আবার সম্পর্কে জিতু সর্দারের গুরুভাই। জিতু সর্দার ছিলেন বিশ শতকের মালদায় সাঁওতাল আন্দোলনের প্রধান নেতা। যিনি আগষ্ট আন্দোলনে জনগনকে খাজনা বন্ধের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুলিসের লাঠিতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলেন[23]। তথাপি তিনি আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসেননি, তাঁদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর অসামান্য দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে বহু গান রচিত হয়েছিল।

দিনাজপুরে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ[24]। এখানে ১৯৪২সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবীরা দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালত, ডাকঘর, সাব রেজিষ্ট্রি অফিস আক্রমন করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আদিবাসী কৃষক গঙ্গারাম ওরাঁও এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মরাডাঙ্গা গ্রামের সাঁওতাল নেতা ফুলচাঁদ মুরমু তিনি আদিবাসীদের নিয়ে ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাড়াবার জন্য আহ্বান করেছিলেন[25]। পুলিস ফুলচাঁদ মুরমুর উদ্যোগকে ভেস্তে দেবার জন্য তার বাড়ী ভাঙচুর করেছিল। ইসলামপুরের চোপড়া থানার জ্যেঠা হাঁসদার বাড়ীতে লোকনায়ক জয় প্রকাশ আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার উপস্থিতিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। দিনাজপুরে ২৪শে সেপ্টম্বর পারিলা গ্রামে সাঁওতালদের সাথে পুলিসের সংঘর্ষ হয়েছিল[26]। সেই সংঘর্ষে বহু সাঁওতাল আহত হয়েছিল এবং তিনজন মারা গিয়েছিল।

দক্ষিনবঙ্গের মধ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের মধ্যে দিনাজপুর ও মালদায় সাঁওতালদের ভূমিকা অতি সক্রিয় ছিল। তথাপি পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ছোটনাগপুর অঞ্চলের মত ব্যাপক সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর কারন হিসাবে গবেষকরা বলেছিলেন বাংলায় জাতীয় ও রাজ্যস্তরের নেতাদের সাথে সাঁওতালদের একটা দূরত্ব থেকে গিয়েছিল। কারণ জঙ্গলময় এলাকায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্ত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। ফলে সাঁওতালরা জাতীয় নেতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারেনি। আন্দোলন সংক্রান্ত জাতীয় স্তরের কোন নির্দেশ অনেক দেরি করে পৌঁছাত আঞ্চলিক স্তরে। তুলনায় সাঁওতাল পরগনা, দুমকা, ছোটনাগপুর অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল ফলে তারা আন্দোলনে অনেক সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বাংলার বাইরে আদিবাসীরা অনেক বেশি তাঁদের উন্নত পরিবেশের সুযোগ নিতে পেরেছিল।

এই গবেষনা পত্রে আলোচনা করেছি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাংলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভূমিকা। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে অনুসরনে বলা যায়- সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের সমস্ত শক্তি ও আবেগ দিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছিল। তাদের দেশপ্রেম অন্যান্য সাধারন গোষ্ঠীর তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। তাদের বীরত্ব, দেশপ্রেম নিয়ে অনেক লোক গাথা, গান, কবিতা লেখা হয়েছিল। সেখানে একটি লেখায় এক সাঁওতালী মায়ের ছেলের কাছে আর্তি করছেন সেই অতীতের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনার জন্য। তিনি ব্রিটিশদের শেষ দেখতে চেয়েছেন।

সুবোধ ঘোষের মতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অবদান সত্বেও তারা প্রাপ্য সম্মান পায়নি। তাদের নামে কোন স্মৃতি সৌধ বা ফলক বানানো হয়নি, অথচ অন্যান্য অনেক জাতীয় নেতাদের যথারীতি বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সাঁওতালরা কিন্তু আন্দোলনের সময় তাদের নিজস্ব স্বত্বা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন যখন প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে তাদের ২৪ঘন্টা হরতাল করার কথা বলা হয়েছিল, সেই নির্দেশ তাঁরা মানেনি। কারন কাজের প্রতি তাদের আজীবন দায়িত্ববোধ যা তাঁদের জাতিগত ধর্ম। কিন্তু তারা অন্যান্য নির্দেশ খাজনা বন্ধ, আবগারী দপ্তর ধ্বংস ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। আরও বলা যায় তাদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু ছিল আবগারী দপ্তর। মদের দোকান, মহাজনী কারবার ছিল অত্যাচারের প্রতীক, অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করত যে তাদের ভূমিচ্যুত, আর্থিক দূর্দশার জন্য এই সমস্ত জিনিস গুলিই দায়ী। তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগের নজির যথা পদ্মলোচন মান্ডির চাকরি পরিত্যাগ, আমিয় কিস্কুর কেরিয়ার বিসর্জন, সবই ছিল দেশের প্রতি তাদের আত্মত্যাগ। অন্যায় ব্রিটিশ শাসন শেষ করার জন্য আদিবাসীদের মধ্যে যে জাতীয় চেতনা যথেষ্ট ছিল তা কোন ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

আলোচনা শেষ করবো একটি সাঁওতালী ভাষায় লেখা কবিতা দিয়ে। কবিতাটির লেখক অকাল যুগী। এটি প্রাকাশিত হয়েছিল 'পছিম বাংলা' এর ৩য় সংখ্যায়, ১৯৭৩ সালে। সাঁওতালরা বিয়াল্লিশের আন্দোলনকে ঠিক কি ভাবে দেখেছিল তা এই কবিতায় পাওয়া যায়। কবিতাটি হলো....

"চালাঃতিঞমে বাবা আয়ো রডে এহবা
বাইরীক সাঁও তুপুৎ আপুম তুলুজ
পেঁড়ে পেঁড়ে আয়োআঃ সারেড়ঃআ মেঁৎ দাঃ
এনহঁ ঞেলঃতায়া মচারে মুলুচ্।
জানাম দিসম আমাঃ জিৎকৌর আপুমাঃ
জিৎকৌর খেরওয়াল বায়ারকোওয়াঃ
সিধু কানহু ঞুমাতে হটঃরে সেরমাতে
বাইরী হেলেচ্ কোপে আঁদাঃ তাওয়াঃ।
আপেরেন আয়ো আলো রঃ নৌকিজঃ আলে
মেঁড়হেঁৎ সাকম হঁলে হরঃ রুওয়ৌড়
কেটেকাজান মনে ধিরি লেকগে ত অনে
তিসগে বাইরী কলে ঞেলক উজৌড়।
দিসম হড়ক হুদিস ঊনিশ'শ বিয়াল্লিশ
সনা আখরতে অল নাগাম মেনাঃ
বাংগে হিড়িঞঃ আদঃ যায়যুগ জেওয়েদঃ
বার্ গেল্ মিৎ অগাস্ট রেনাঃ।

উপরোক্ত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ হলো নিম্নরূপ ----

'যাও বাছা, মা বলতে থাকে শত্রুদের সঙ্গে কর'। চোখে ছল ছল করে ওঠে আসে জল। তবুও মুখে দেখা যায় আনন্দের ঝিলিক।

মাতৃভূমি তোমার, জয় হোক তোমার বাবার। জয় হোক খেরওয়াল যোদ্ধাদের। সিধু-কানহুর নাম নিয়ে এসো পাথাড়ি শত্রু নিধন কর।

তোমাদের মা আমরা, আবার আমরা চুলে চিরুণী দেব। আবার লোহার বালা (নোয়া) পরব আমরা। মন ঠিক পাথরের মতই শক্ত করেছি। কবে দেখব শত্রু সব নিধন হয়েছে।

দেশবাসী ঊনিশ'শ বিয়াল্লিশ সালকে মনে রাখবে। ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। কখনও ভলা যাবে না, যুগ যুগ বেঁচে থাকবে ২১শে অগাস্টের কথা'[27]।

কবিতায় দেখা যাচ্ছে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করতে আহ্বান করা হচ্ছে। মায়েরা প্রতিজ্ঞা করছে, তাঁরা বলছে বিয়াল্লিশের আন্দোলন স্মরণীয় করে রাখো। অর্থাৎ বলা যায় জাতীয় আন্দোলনের প্রতি, দেশের প্রতি তাঁদের আত্যত্যাগ ও ভালোবাসা কতখানি ছিল।

তথ্যসূত্র :

1. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩, পৃ-৩৩৪
2. সূচিব্রত সেন ও আমিয় ঘোষ, আধুনিক ভারত - ১৮৮৫ -১৯৬৪, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কলিকাতা মিত্রম, ২০০৮, পৃ-৩৬৬
3. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপান্তর - রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮ - ১৯৪৭) ষষ্ঠ প্রকাশ, কলিকাতা, ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০০৬-০৭, পৃ-৬৪৮
4. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপকার, পূর্বোক্ত, পৃ - ৬৪৮.
5. Ranajit Guha(ed), Subaltan studies, vol.2, OUP, 1983, PP-145-49
6. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপকার, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৫২
7. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপকার, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৫৩
8. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপকার, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৫৩
9. সূচিব্রত সেন ও আমিয় ঘোষ, আধুনিক ভারত - ১৮৮৫ -১৯৬৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬৯
10. সূচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬৩
11. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৬, পৃ-৪৯১
12. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৯২
13. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা, বাস্কে পাবলিকেশন, ২০১৩, পৃ-১৯
14. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ- ২০
15. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪
16. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৫২
17. *Pradip Chattopadhyay*, **Redefining Tribal Identity**- *The changing Identity of the Santhals in South-West Bengal*, First Edition, Delhi, Primus, 2014.
18. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ- ২২
19. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১
20. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৭
21. সূচীব্রত সেন ও আমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৬৮
22. সুচীব্রত সেন ও আমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬৫
23. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭
24. সূচীব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬৭
25. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬
26. ধনঞ্জয় রায়, দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, কলকাতা, কে.পি বাগচি এন্ড কোম্পানি, ২০০৬, পৃ-৩১৩
27. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পৃ- ২৩-২৪